কৃপাজগতের ‘ঘাই ফুট’

স্বামী বলভদ্রানন্দ

সহকারী সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

শিরোনামের শেষ শব্দটি উদ্ভট, তথাপি সেটি কথামৃত; কারণ অবতারবরিষ্ঠের শ্রীমুখনিঃসৃত। যারা ছিপ ফেলে মাছ ধরে, তারা বঁড়শিতে মাছের কোনও লোভনীয় খাদ্যকে ‘চার’ হিসেবে লাগিয়ে ছিপ ফেলে বসে থাকে, মাছ বঁড়শিটিকে গিলে ফেলার আগে প্রথমে কাছে এসে চারটিকে ছোট ছোট ঠোকর দিয়ে পরখ করে, তখন জলে ভেসে থাকা ফাতনাটিও নড়তে থাকে। সেটিকেই বলে ‘ঘাই ফুট’ বা ‘ফুট ঘাই’। যে-প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভু এটি ব্যবহার করেছেন তার একটি প্রসঙ্গ এরকম : সিমলার রামচন্দ্র দত্ত আর কোন্নগরের মনোমোহন মিত্র মাসতুতো ভাই। বয়সের ব্যবধান মাত্র দুমাস। মনোমোহনের বাড়ি কোন্নগরে হলেও কাজের সুবিধার জন্য সিমলা স্ট্রিটে আর-একটি বাড়ি কিনে তিনি সেখানেই বাস করতেন। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করলেও রসায়ন ও ডাক্তারি শাস্ত্রের চর্চা করতে করতে রামচন্দ্র ক্রমশ নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক হয়ে যান এবং তাঁর প্রভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী মনোমোহন সংশয়বাদী হয়ে পড়েন। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুজনে প্রায় একই সময়ে তাঁদের

প্রাণসমা কন্যাকে হারিয়ে জগতের নশ্বরতা বুঝতে পারেন এবং কেশবচন্দ্রের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কথা জানতে পেরে শান্তির সন্ধানে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হন। তখন দুজনেরই বয়স ২৮ বছর। ঠাকুর প্রথম দর্শনেই তাঁদের এত আপন করে নেন যে অসংকোচে তাঁরা ঠাকুরের কাছে বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁদের সন্দেহ আছে। অকপট কথা সব সময়ই ঠাকুর পছন্দ করতেন। তাই একটুও বিরক্ত না হয়ে শক্তিপূর্ণ সংশয়চ্ছেদী বাক্যে ঠাকুর তাঁদের বলে চলেন, "ঈশ্বর আছেনই আছেন। দিনের আকাশে তারা দেখা যায় না, তাই বলে কি আকাশে তখন তারা নাই?... ঈশ্বরের দেখা পেতে হলে কিছু সাধনা দরকার। বড় পুকুরে মাছ ধরতে হলে আগে যারা তাতে মাছ ধরেচে তাদের কাছে কেমন মাছ আছে, কিসের টোপে খায়, কী চার প্রয়োজন, এই সব খবর জেনে নিতে হয়; ছিপ ফেলে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হয়; 'ঘাই-ফুট' দেখতে পেলে মাছ আছে বলে বিশ্বাস হবে, ক্রমে মাছও ধরা পড়বে। ঠিক তেমনি যিনি ঈশ্বরকে দেখেচেন তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মন-ছিপে প্রাণকাঁটায় নামের টোপ দিয়ে, ভক্তির চার ফেলে অপেক্ষা করতে হবে, তবেই ঈশ্বরের ঘাই-ফুট দেখতে পাওয়া যাবে; পরে একদিন তাঁর কৃপায় তাঁর সাক্ষাৎকার হবে।"

মন জুড়ে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সেদিন থেকেই না জাগলেও ঠাকুরের ভালবাসার আকর্ষণে এরপর থেকে ছুটির দিনগুলোতে তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে আসতে শুরু করলেন। কিন্তু মনের অশান্তি কমল না। এবার অশান্তির প্রকার অন্যরকম। ঈশ্বর আছেন এটি স্থির হল না, আবার আগের মতো কোনও কিছুর পরোয়া না করে বলতেও পারেন না যে, ঈশ্বর নেই। এ এক অসহনীয় দ্বন্দ্ব।

একদিন বেলা এগারোটার সময় পটলডাঙার গোলদিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসে দুজনে তাঁদের মনোদুঃখের কথা বলছেন, এমন সময় একটি অপরিচিত লোক কাছে এসে মৃদুস্বরে তাঁদের বললেন, "ব্যস্ত হচ্চ কেন? সয়ে থাক।" দুজনেই চমকে উঠলেন। ভাবলেন, "কে আমাদের প্রাণের কথা বুঝিয়া অশান্তিরূপ প্রজ্বলিত হুতাশনে... আশাবারি ঢালিয়া দিলেন?... এই কি ঈশ্বরের 'ফুট ঘাই?' কি এ? তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দেখি, আর তিনি নাই!'' অথচ দুজনেই পরিষ্কার সেই ব্যক্তিটিকে দেখেছেন। "সেইদিন এই ধারণা হইল যে, ঈশ্বর আছেন। পরমহংসদেবকে এই সংবাদ প্রদান করা হইলে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদুহাস্যে কহিলেন, 'কত কি দেখবে।' "

আধ্যাত্মিক জগতের এরকম দু-একটি ঘটনা—যা অভাবনীয় কিন্তু ঘটেছে—এখানে বলব। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল পার্ষদ-পরবর্তী যুগের বরেণ্য সন্ন্যাসী, রাজা মহারাজজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষাপ্রাপ্ত স্বামী বিজয়ানন্দজীর জীবনে এবং শুনেছিলাম, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আর-এক সন্ন্যাসী, এখন প্রয়াত, স্বামী শক্তিদানন্দের কাছে। মাধবানন্দজীর কৃপাপ্রাপ্ত এই সন্ন্যাসী তখন পাটনায় থাকতেন; তিনি ইনস্টিটিউট অব কালচারে এসে মাঝে মাঝে থাকতেন, আমিও তখন সেখানে থাকতাম। তখনই প্রবীণ এই সন্ন্যাসীর কাছে একাধিকবার শুনেছিলাম এই ঘটনাটি। শক্তিদানন্দজী তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম অনুযায়ী জীবন মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। বিজয়ানন্দজী একাধিকবার পরীক্ষা করেছেন ঠাকুর এখনও আছেন কী না। প্রতিবারই প্রমাণ পেয়েছেন তবুও তাঁর সংশয়

যায়নি। একদিন ভোরবেলায় তিনি মঙ্গলারতিতে যাওয়ার জন্য ঠাকুরঘরে যাচ্ছেন। 'ঠাকুরঘর' মানে এখন স্বামীজীর ঘর চত্বরে যেটিকে পুরনো মন্দির বা পুরনো ঠাকুরঘর বলা হয়, যেখানে বাঁদিকের ঘরে ঠাকুর-মা-স্বামীজী ও রাজা মহারাজের ছবি এবং ডানদিকের ঘরে শয্যার উপর মহাপুরুষ মহারাজজীর ছবি রাখা আছে। সেই সময় মঠে প্রতিদিন পাশাপাশি অঞ্চল থেকে একটি মেছুনি আসত এবং একটি নির্দিষ্ট সুর করে উচ্চস্বরে বলত, "বাবু গো! মাছ নেবে গো!" তার আসার স্বাভাবিক সময় সকাল আটটা-নটার আগে নয়। কিন্তু পুরনো ঠাকুরঘরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বিজয়ানন্দজীর সেদিন মনে হল : এই অতি অসম্ভাব্য সময়ে মেছুনিটি এসে যদি ঠিক একইরকমভাবে ডাক ছাড়ে তবে বুঝব যে ঠাকুর আছেন এবং এই মঠভূমিতে তিনি সাক্ষাৎরূপে জাগ্রত। যেই ভাবা, ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে মেছুনির সেই বিশেষ সুরে উচ্চস্বরে ডাক : "বাবু গো! মাছ নেবে গো!" ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই এমন তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপারটি ঘটল যে, বিজয়ানন্দজী বিহ্বল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ির উপরে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর দুহাত ওপরের একটি সিঁড়ির ওপর, দু-পা নিচের একটি সিঁড়ির ওপর, দৃষ্টিও সিঁড়ির ওপরে। কী ঘটল ঠিক বুঝতে না পেরে তিনি ওই অবস্থাতেই থরথর করে কাঁপছেন। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁর মনে হল, সিঁড়ির উপরে সামনে যেন কেউ দাঁড়িয়ে আছেন। ধীরে ধীরে চোখ তুলে দেখেন রাজা মহারাজ। রাজা মহারাজজীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মহারাজ কোনও ভূমিকা না করেই তাঁকে বললেন, "কথা দে, আর কখনও পরীক্ষা করবি না!" অর্থাৎ যা ঘটেছে রাজা মহারাজ সব জানেন।

এবার দ্বিতীয় ঘটনা। সময়টা হবে ১৯৯৭-৯৮ সাল। স্বামীজীর ভারত প্রত্যাবর্তনের এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উৎসব পালিত হচ্ছে সর্বত্র। সেই উপলক্ষ্যেই মেদিনীপুরের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়েছিলাম একটি ধর্মসভায় যোগ দিতে। আমার সঙ্গে ছিলেন একজন সন্ন্যাসী। ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকেই গিয়েছিলাম। সেদিন গিয়েই সেদিনই আর কলকাতায় ফিরে আসা যায় না বলে এক রাত আমাদের কাছাকাছি একটা গ্রামে থাকতে হয়েছিল।

যে-বাড়িতে আমাদের থাকতে দেওয়া হল, সেই বাড়ির মালিক আশি বছরের এক বৃদ্ধ। কিছুদিন আগেই তিনি অসুখ থেকে উঠেছেন। কিন্তু বাড়িতে সাধু এসেছেন দেখে তিনি সব ভুলে গেছেন। নিজেই ঘটি ভর্তি জল নিয়ে এসে আমাদের পায়ে ঢেলে দিতে গেলেন। আমার কিছুদিন আগে পা ভেঙেছিল বলে পায়ে ক্রেপ ব্যান্ডেজ লাগানো ছিল। তাই বেঁচে গেলাম, আশি বছরের বৃদ্ধের জলসেবা নিতে হল না; কিন্তু অন্য সাধুটিকে তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না, পায়ে জল ঢেলে নিজের হাতে তাঁর পা মুছে দিলেন। মানুষটি স্বল্পবাক, কিন্তু মুখে কথা না বললেও সাধুদর্শনের আনন্দ তাঁর প্রতিটি আচরণে ফুটে উঠছে। সন্ধ্যার একটু আগে একটি ট্যাক্সিতে করে আমরা পাশের গ্রামে যেখানে সভা হবে সেখানে গেলাম। ট্যাক্সিতে গেলাম বলে, সেই বৃদ্ধকেও বাড়ির লোকেরা আমাদের সঙ্গে যেতে দিলেন। ফেরার সময় ট্যাক্সিতে সেই বৃদ্ধ আমার পাশে বসেছেন। যথারীতি তিনি মৌন, অন্যেরা কথা বলছেন। হঠাৎ মৌনতা ভেঙে তিনি আমায় বললেন, "ভারতবর্ষের বহু তীর্থস্থান ঘুরেছি, কিন্তু

কন্যাকুমারীর মতো এমন জাগ্রত তীর্থস্থান আর হয় না।" আমি বললাম, "কেন এমন কথা বলছেন বলুন তো?" উনি বললেন, "ওখানে স্বামীজীর মন্দিরে চোখ বুজে বসলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর এসে দেখা দিলেন।" কথাগুলি তিনি এত স্বাভাবিকভাবে এবং অকস্মাৎ বললেন যে, আমি অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "স্বামীজীর দেখা পেলেন, না ঠাকুরের?" উনি বললেন, ''ঠাকুরের।'' সারা রাস্তা আর কোনও কথা বললেন না। ওই কথাগুলিও তিনি বলেছিলেন খুব নিচু স্বরে, আমি ছাড়া কেউ শুনতে পেল না।

পরের দিন সকালবেলা ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি যেচে কথাবার্তা বললাম। তিনি যে-কাহিনি শোনালেন, ভারি অদ্ভুত। ভদ্রলোকের চারটি মেয়ে, চারজনেই সুশিক্ষিত ও কর্মরত। তিনি নিজে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। সবাই তাঁকে ধন্বন্তরি বলে মনে করে। কিন্তু শরীরের জন্য বাড়ির লোকেরা এখন আর তাঁকে চিকিৎসা করতে দেন না। এর জন্য তাঁর ভীষণ দুঃখ, ''আমি এখন আর রোগী দেখতে পারি না'' বলে বেশ কয়েকবার তিনি আমার কাছে কেঁদে ফেললেন। তিনি যে হোমিওপ্যাথি করবেন, জীবনের শুরুতে ভাবেননি। একটি মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রে হোমিওপ্যাথিতে আসেন। তাঁর একটি ছেলে ছিল, একমাত্র ছেলে। ছেলেটির একবার ম্যালেরিয়া হল। তাঁর বয়ানেই বলছি, যতটা স্মরণে আছে : "ম্যালেরিয়া হলে যেমন হয়। যতক্ষণ জ্বর থাকে, কান্নাকাটি করে, বিছানায় ঘোরের মধ্যে পড়ে থাকে। আর জ্বর ছাড়লেই খেলাধূলা দৌড়াদৌড়ি করে। বাচ্চা ছেলে তো! সেদিন সকাল নটা হবে। জ্বর ছেড়েছে তাই উঠোনেই খেলাধূলা করছে। গ্রামের যে-ডাক্তার ওকে রোজ কুইনাইন ইনজেকশন দেন তিনি এসে হাজির। বললেন, ওকে ইনজেকশনটা দিয়ে যাই। আমি বললাম, এখন খেলছে এখনই দেবেন? পরে না হয় দেবেন। উনি বললেন, না আজ সারাদিন থাকব না, এখনই দিয়ে যাই। ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে হাতটা চেপে ধরলাম। ডাক্তার সিরিঞ্জ ফুটিয়ে ইনজেকশন পুশ করলেন কিন্তু কিছু বোধহয় গোলমাল হয়ে গেল। এখুনি যে ছেলেটা খেলছিল, আমার কোলেই ঠকঠক করে মরে গেল।'' আমি বললাম, ''সেই ডাক্তারকে কিছু বললেন না?'' তিনি বললেন, "না, ছেলেকে তো পাব না!" মনকে ব্যস্ত রাখতে খুব যত্ন করে হোমিওপ্যাথি শিখতে লাগলেন। আর সেইসময়ই তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন, "শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" তাকেই মন্ত্র করে তিনি রোগীর সেবা শুরু করলেন। সারা জীবন তাই করেছেন। অদ্ভুত অদ্ভুত রোগ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় সারিয়েছেন। আমি নিজেও দেখলাম বেশ কিছু লোক আসছে তাঁকে দেখানোর জন্য। কিন্তু মেয়েরা তাঁর বয়স ও অসুস্থতার কথা ভেবে তাদের বারণ করে দিচ্ছেন। নির্লোভ, সৎ, সরল, সম্পূর্ণ আত্মপ্রচারশূন্য মানুষ। মানুষটিকে দেখে ও কথা বলে আমার বিশ্বাস হয়েছে, তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের কথা বললেন তা তাঁর মনের ভুল নয়, মিথ্যে কথা বা বাগাড়ম্বর তো নয়ই।

এরকম আর-একটি কাহিনি বলি। আমি ইনস্টিটিউট অব কালচারে থাকাকালীনই এক ভদ্রলোক এলেন দক্ষিণ কলকাতার এক জায়গায় একটি মন্দির উদ্বোধনের জন্য। তার আগে বেলুড় মঠ থেকে পূজ্যপাদ শিবময়ানন্দজী ফোন করে আমাকে ওই ভদ্রলোকটির কথা বলে দিয়েছিলেন। ছোট্ট মন্দির, সেটি তৈরি হয়েছে

তাঁরই ব্যক্তিগত উদ্যোগে, তাঁরই একফালি জমিতে। ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে জায়গাটির দূরত্ব গাড়িতে আধ ঘণ্টার মতো। উদ্বোধনের পরে যখন ফিরে আসছি, ভদ্রলোক গাড়িতে করে আমার সঙ্গে আসছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''হঠাৎ আপনার এরকম একটা ইচ্ছে হল কেন? ওই জমিতে ঘরবাড়ি কিছু না করে ঠাকুরের মন্দির করলেন?" ভদ্রলোক তখন বললেন, "মহারাজ, এর পেছনে একটা ঘটনা আছে। আমি থাকি আপনাদের গোলপার্কের খুব কাছাকাছি। ওখানেই বাড়ি, স্বামী-স্ত্রী শুধু থাকি। ছেলেমেয়েরা বাইরে থাকে। আগে আমাদের এক ঘর ভাড়াটে ছিল। তাদের নিয়ে অনেকদিন ধরে অসুবিধে হচ্ছিল। আমরা বলছিলাম উঠে যেতে, উঠে যাচ্ছিল না। শুধু তাই নয়, তারা পাড়া-প্রতিবেশীদের কান ভাঙিয়ে রাজনৈতিক দলের সাহায্য নিয়ে আমার এমন অবস্থা করল যে, আমরা দুজনেই অপমানের ভয়ে বাড়ি থেকে বের হতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কোর্টে গেল, কিন্তু সেখানেও আমার জেতার আশা দেখছিলাম না। ওদের উকিল অনেক ভাল; দুর্ভাগ্যক্রমে আমার উকিল একটু নিরীহ ধরনের, ভাল করে সওয়াল করতে পারে না। মনটা খুব ভেঙে গিয়েছিল। একদিন খাবার পরে শুয়ে নানা কথা ভাবছি। ঠাকুরকে বলছি, 'ঠাকুর, কোনও দোষ করিনি, জীবনে কারও ক্ষতি করিনি, তবুও এত লাঞ্ছনা-অপমান সহ্য করতে হবে? নিজের বাড়িতেই চোরের মতো থাকতে হবে?' হঠাৎ দেখি, জানালার বাইরে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। গায়ে চিমটি কাটলাম, ঠিক দেখছি তো? হ্যাঁ, ঠিকই দেখছি, ঠাকুরই। বহুদিন পরে সে-রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমোলাম। তার পরদিন থেকেই সব ঘটনার মোড় একটু একটু করে ঘুরতে শুরু করল। এক বছরের মধ্যেই মামলায় আমার জিত হয়ে ভাড়াটে উঠে গেল, বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। তখনই ঠিক করেছিলাম, ঠাকুরের জন্য একটা মন্দির করব। এখানে একফালি জমে পড়েছিল, তাই বাড়ি থেকে দূরে হলেও এখানে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করলাম।" এখন ওই আশ্রমে রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক মহারাজ যান। প্রতিবছর একবার উৎসব হয়। ওই ভদ্রলোক অবশ্য অনেকদিন হল প্রয়াত।

আর-একটি ঘটনা। পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজীর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্তা এক ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিলেন তিনি ঘরে বসে একদিন 'লীলাপ্রসঙ্গে' গিরিশ ঘোষের বকলমা দেওয়ার কথা পড়ছিলেন। ভদ্রমহিলার ব্যক্তিগত জীবনে দীর্ঘদিন ধরেই অনেক দুঃখ ও অনিশ্চয়তা। রাত্রিবেলা জপধ্যানের পর একলা ঘরে একমনে গিরিশ ঘোষের বকলমা দেওয়ার কাহিনি পড়ছেন, আর মনে মনে অভিমান করে বলছেন, "যখন তুমি স্থূলশরীরে ছিলে তখন এসব করতে, এখন আমাদের কথা তোমার কানেও যায় না।" ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিলেন, "মহারাজ, এরকম ভাবছি, হঠাৎ শুনি জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর : 'দে, দে তবে আমাকে তোর বকলমা।' তাকিয়ে দেখি, ঠাকুরের আসন যেদিকে, সেদিকে দেওয়াল জুড়ে ঠাকুর বসে রয়েছেন; সেই কণ্ঠস্বর, সেই মূর্তি এখনও মনে গেঁথে রয়েছে।''

ইনস্টিটিউট অব কালচারে লোকেশ্বরানন্দজী যখন সেক্রেটারি ছিলেন, তখন স্বভাবতই অনেক ভক্ত বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নেওয়ার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতেন। পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁদের আমার

কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমি তাঁদের দীক্ষালাভের জন্য কমপক্ষে কী কী বই পড়তে হয় সেটা যেমন বলে দিতাম, তেমনই প্রেসিডেন্ট মহারাজের প্রধান সেবক মহারাজকে বলে তাদের জন্য ফর্ম আনিয়ে দিতাম। তাঁরা ফর্ম পূরণ করে আমাকে দিলে আমি সেগুলি পড়ে একটু দেখতাম ঠিক আছে কী না, তারপর সেই পূরণ করা ফর্ম আবার প্রেসিডেন্ট মহারাজের প্রধান সেবকের কাছে পাঠিয়ে দিতাম। বেলুড় মঠের কাছে থাকা একটি ছেলে ইনস্টিটিউট অব কালচারের কর্মী ছিল বলে তার মাধ্যমেই প্রতিদিনের এইসব চিঠিপত্র ও কাগজপত্র আদান-প্রদানের একটা সুবিধা ছিল।

একদিন লোকেশ্বরানন্দজীর প্রেরিত দীক্ষার্থী এক মহিলা, যাঁকে কিছুদিন আগে আমিই বেলুড় মঠ থেকে ফর্ম এনে দিয়েছিলাম, তাঁর পূরণ করা দীক্ষা-ফর্মটি নিয়ে আমার কাছে এলেন। তখন ফর্মে এরকম একটা কথা লেখা থাকত (হয়ত এখনও লেখা থাকে), কবে থেকে তোমার দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছে হয়েছে? ভদ্রমহিলার দীক্ষা-ফর্মটিতে চোখ বোলাতে গিয়ে দেখলাম, সেই জায়গাটিতে লেখা আছে, "কয়েক বছর আগে বন্ধুদের সঙ্গে কন্যাকুমারী বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন থেকে।" আমার বেশ অবাক লাগল, কৌতূহল চাপতে না পেরে বলেই ফেললাম, "আচ্ছা এরকম কেন লিখলেন?" বলেই লজ্জিত হয়ে বললাম, "না না, এটা আপনার একান্ত নিজস্ব কথা; বলবার দরকার নেই।" কিন্তু উনি বললেন, "না না, আপনাকে বলতে কোনও সংকোচ নেই। আপনি আমার দীক্ষার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, বড় মহারাজ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন—আপনাকে বলতেই পারি।" তারপর তিনি এক অদ্ভুত কাহিনি শোনালেন।

ভদ্রমহিলা যখন আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁর বয়স তখন বছর ষাটেক হবে। তাঁর একটি চোখ জন্ম থেকে একটু খারাপ—বাইরে থেকে দেখতেই সামান্য অস্বাভাবিক। ছোটবেলায় যখন খেলতে যেতেন, বন্ধুরা তাঁকে চোখ নিয়ে খেপাত। তিনি কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে এসে নালিশ করতেন। মা খুব ব্যথা পেয়ে তাঁকে একদিন একটি সুন্দর বালগোপালের মূর্তি দিয়ে বললেন, ''আর তোমাকে বাইরে গিয়ে খেলতে হবে না, এই গোপালই তোমার খেলার সাথী।'' তিনি মায়ের কথায় বিশ্বাস করে ছোটবেলা থেকেই গোপালকে নিয়ে মেতে থাকতেন। সরল বালিকার বিশ্বাস তো! মাঝে মাঝে তাঁর কিছু কিছু অনুভূতি হত। একলা ঘরে শুয়ে আছেন, উপর থেকে নীল কুয়াশার মতো কিছু একটা নেমে এসে তাঁকে আচ্ছাদন করে দিত। এই একান্তে কৃষ্ণকে নিয়েই তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়ে শেষে অল্পবয়সেই তাঁর বিবাহ হয়ে যায়। স্বামী সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর পূজাপাঠে ব্যাঘাতও করতেন না, বিশেষ আগ্রহও প্রকাশ করতেন না। এভাবেই তাঁর জীবন কেটেছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে তখন সম্ভবত কলকাতার বাড়িতে তিনি আর তাঁর স্বামী শুধু থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশনের নাম শুনলেও কোনও বিশেষ আগ্রহ তখনও তাঁর তৈরি হয়নি। তিনি নিজের মতো করে পূজা-আচ্চায় সন্তুষ্ট থাকেন। এর মধ্যে একবার তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গিয়ে কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হলেন। জায়গাটি দেখে মন একেবারে জুড়িয়ে গেল। বন্ধুবান্ধবরা প্রধান মন্দিরে স্বামীজীর দাঁড়ানো মূর্তিটিকে দর্শন করেই বাইরে সমুদ্র

দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তিনি সেখান থেকে নড়তে পারলেন না; ওই হলঘরটিতে বসে এক নিমেষে স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ দেখেন স্বামীজী জীবন্ত হয়ে উঠেছেন, তাঁর পরনের কাপড় হাওয়ায় নড়ছে, তিনি হাসিমুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। হঠাৎ স্বামীজী বাঁদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে কারও দিকে তাকিয়ে তাঁকে নির্দেশ করলেন সেদিকে তাকাতে। স্বামীজীর দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, একজন দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। ভাল করে তাঁকে দেখছেন, এমন সময় বন্ধুদের কয়েকজন সেখানে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল, "এই তুই কী করছিস?" সঙ্গে সঙ্গে সব দৃশ্য উধাও হয়ে গেল, স্বামীজি আবার মূর্তি হয়ে গেলেন।

ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেই তিনি সেই সন্ন্যাসীর খোঁজ করতে লাগলেন। দক্ষিণ কলকাতার বেশ কয়েকটা আশ্রমে গিয়ে তিনি খোঁজ করলেন। সেই সময়ই জানলেন, গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র আছে। একদিন ঠিক দশটার সময় সেখানে গেছেন। মেন গেট দিয়ে ঢুকে সামনে টাঙানো ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ছবিকে প্রণাম করছেন, এমন সময় দেখলেন ওপর থেকে লিফটটি নেমে এল; সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি যে-কর্মী ও ভক্তরা ছিল, তারা লিফটের মধ্যে যিনি আছেন, তাঁর দিকে প্রায় ছুটে গেল। কে তিনি—এই ভেবে তিনি সেদিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে অবাক—এই সেই সন্ন্যাসী, যাঁকে কন্যাকুমারীতে স্বামীজী তাঁর দৃষ্টি দিয়ে নির্দেশ করেছিলেন। আসলে লোকেশ্বরানন্দজী তখন প্রতিদিনের মতো চারতলা থেকে লিফটে করে নেমে অফিসে যাচ্ছিলেন। এরপর থেকেই তিনি লোকেশ্বরানন্দজীর কাছে নিয়মিত আসতে শুরু করেন এবং দীক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "মহারাজ অর্থাৎ লোকেশ্বরানন্দজী জানেন আপনার এই দর্শনের কথা?" উনি বলেছিলেন, "না, আমি মহারাজজীকে কখনও একথা বলিনি। আজ প্রথম আপনাকে একথা বললাম, আপনি জানতে চাইলেন বলে।"

যে-কয়েকজন ভক্তের কথা এখানে বললাম, তাঁরা প্রত্যেকেই দশজনের মাঝখানে মিশে-থাকা সাধারণ মানুষ। আপাতদৃষ্টিতে কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু প্রত্যেকেই সৎ, নিরহংকার, আত্মপ্রচারবিমুখ। এঁদের প্রত্যেকের জীবনেই বেশ কিছু ঝড়ঝঞ্ঝা গেছে। মা বলেছেন, "দুঃখই তো ভগবানের দয়ার দান।" সেই দানের প্রাপ্তি এঁদের প্রত্যেকের জীবনেই কমবেশি ঘটেছে। এঁরা কেউ নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে আমাকে ঘটনাগুলি বলেননি, বিশেষ প্রসঙ্গে বলেছেন এবং আমি সন্ন্যাসী বলেই বিশ্বাস করে আমাকে বলেছেন, অন্য কাউকে বলেননি। আমি তাই এঁদের দর্শন ও কাহিনিগুলি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছি।

গুরুকৃপার একটি অদ্ভুত কাহিনি বলে শেষ করব। যাঁর জীবনে ঘটেছে তাঁর মুখেই শোনা। তিনি স্বামী জিনানন্দজী, সাতানব্বই বছর বেঁচে ছিলেন। দীক্ষা হয় স্বামী বিরজানন্দজীর কাছে, দিল্লি আশ্রমে। আমি যখন আসানসোল আশ্রমে ছিলাম তখন তিনি কয়েকদিনের জন্য সেখানে এসেছিলেন। বেলুড় মঠই তখন তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। সেখানে থাকাকালীনই তাঁর নব্বই বছর পূর্ণ হয়। সেদিন তিনি আমাদের এই কাহিনিটি শুনিয়েছিলেন: তিনি তখন দিল্লিতে চাকরিরত এবং আশ্রমে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন প্রায় প্রতিদিনই। সাধুরা তাঁকে সাধু হওয়ার কথা বলেছেন, তিনিও ভেবেছেন সাধু হবেন,

সংসারজীবনের প্রতি কখনই তাঁর আকর্ষণ বোধ হয়নি—তবু নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তটি নিতে পারছিলেন না। মাঝে মাঝে ভাবেন : এই তো বেশ আছি! বিয়ে-থা করে সংসারে যে যাব না সে তো নিশ্চিত। সকালে অফিস যাওয়ার আগে যতটা আশ্রমে কাজ করা যায়, সানন্দে করছি। আবার অফিসের পরেই আশ্রমে এসে যতটা পারি সেবা করছি। সুন্দর স্বাধীন জীবন—সংসারের বন্ধন নেই, আবার সঙ্ঘবদ্ধ সাধুজীবনের বন্ধনও নেই। এইভাবেই কাটিয়ে দিই না কেন?

এই সময় তাঁর গুরুদেব পূজ্যপাদ বিরজানন্দজী এলেন দিল্লি আশ্রমে। যেবার তিনি দীক্ষালাভ করেছিলেন, এটি সেবারেরই ঘটনা কী না সে সম্বন্ধে মহারাজ কিছু বলেননি। তবে কথার ধরনে মনে হয়েছিল দীক্ষালাভের পরের কোনও বারের ঘটনা। তাঁর দীক্ষাগুরু এসেছেন আশ্রমে এবং গুরুদেবের কিছু সেবা করতে পারছেন তিনি, সেই আনন্দে তিনি মশগুল। মহারাজের কাছে যে-সেবক সবসময় থাকেন, এক সকালে কোনও কাজে আশ্রমের অন্যত্র গেছেন, আর স্বামী জিনানন্দকে (তখন সাধু নন) ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে গেছেন, মহারাজের দিকে চোখ রাখতে এবং দরকার হলে সেবক মহারাজকে খবর দিতে। পূজ্যপাদ মহারাজ আরামচেয়ারে বসে সামনে তাকিয়ে আছেন আর স্বামী জিনানন্দ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে মহারাজের দিকে তাকিয়ে আছেন। উভয়ের অবস্থানটা এমন যে, পূজ্যপাদ মহারাজ যদি দরজার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান তবেই কেবল স্বামী জিনানন্দের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হবে—না হলে নয়। হঠাৎ বিরজানন্দজী ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে জিনানন্দজীর দিকে তাকালেন। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গালে সপাটে কে যেন চড় মারল এবং এতটাই তার জোর যে তাঁর মুখটা একপাশে ঘুরে গেল। তিনি ভয়ে ভয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার মহারাজের দিকে তাকালেন, কারণ সেটাই তো তাঁর ডিউটি—মহারাজের দিকে তাকিয়ে থাকা। দেখলেন মহারাজ আবার শান্তভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। এরপর পূজ্যপাদ মহারাজ আবার ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন; চোখাচোখি হওয়া মাত্র আবার সেই প্রচণ্ড থাপ্পড়। জিনানন্দজী একেবারে হতভম্ব—কী হচ্ছে এসব! আবার তিনি ভয়ে ভয়ে হলেও কর্তব্যবোধে মহারাজের দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আবারও ঘটল সেই একই ঘটনা। কিন্তু অচিরেই তিনি অনুভব করলেন গুরুদেবের দৃষ্টিপ্রসূত এই পূত চপেটাঘাত, তাঁর মধ্যে সাধুজীবন-বরণ সম্বন্ধে যে-দ্বিধাটি ছিল সেই দ্বিধাটিকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি গৃহ ও চাকরি ত্যাগ করে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন।

তবে একথা বলাই বাহুল্য এবং মনে রাখা কর্তব্য, এরকম চমকপ্রদ ঘটনাই ভগবৎকৃপা বা গুরুকৃপার একমাত্র প্রমাণ নয়। যে-কৃপাবায়ু নিত্য প্রবাহিত বলে যুগাবতার-দ্বারা কথিত, তা নীরব ও শান্ত মন্দ্রেই সকলের জীবনে বয়ে চলে। 'পাল তুলে দিলে' অর্থাৎ সাধনভজন করলে সে-কৃপা অনুভব করা যায় এবং তার নিশ্চিত প্রমাণ সাধকসাধিকারা পান তাঁদের অন্তর্লোকে—ভক্তি-বিশ্বাস-পবিত্রতাদি গুণাবলির ক্রমবৃদ্ধিতে। নি